গাফ্‌ফার চৌধুরীর স্ববিরোধী মিথ্যাচার

লিখেছেন **রাহমান চৌধুরী**

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যারা নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন তাদের একজন হলেন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। যিনি কলাম লেখার নামে শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের পক্ষে সুবিধা মতো সত্য-মিথ্যা বলে থাকেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর মিথ্যাচারে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এমন দক্ষ, চতুর, মিথ্যাচার কেবল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে দিয়ে সম্ভব একথা আগে শুনে থাকলেও বিশ্বাস করিনি। এখন বিশ্বাস করি।'[১] মিথ্যা বলতে গিয়ে তার লেখা নানা স্ববিরোধিতার প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। গাফ্‌ফার চৌধুরী যুগান্তর পত্রিকায় 'কিছু অপ্রিয় সত্য শোনাতে চাই' শিরোনামে ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখ থেকে প্রতি সোমবার একটি করে কলাম লিখে আসছেন। ভিন্ন একটি কলাম লিখছেন প্রথম আলো পত্রিকায় 'একুশ শতকের বটতলায়' শিরোনামে। তিনি অজস্র লিখছেন কিন্তু তার একদিনের লেখার সঙ্গে পরের দিনের লেখার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া ভার। ইদানীং তার লেখায় যে ব্যাপারটি স্পষ্ট, তাহলো বিএনপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণার প্রকাশ। বিএনপির ক্ষমতায় আসাটাকে তিনি যেন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। বিএনপির ক্ষমতা আরোহণকে তিনি মনে করেন একটি ন্যাশনাল ট্র্যাজিডি। এবং বিএনপি জোটের পতনের জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন সেজন্য তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আশা করছেন।

বিএনপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে তিনি প্রচন্ড ক্রোধ নিয়ে লিখেছেন, 'বাংলাদেশে মনে হয় ইতিহাস-ভূগোল সবকিছুই পাল্টে ফেলার অভিযান শুরু হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞান।'[২] 'হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করা, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা এখন তো একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পূর্ণিমার মতো মেয়েদের ধর্ষণ তো কোনো অপরাধই নয়। বাংলাদেশে হিন্দু সম্পত্তি গ্রাস, নির্যাতন দ্বারা তাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা এখন একটি সরকারদলীয় অঘোষিত প্রজেক্ট মনে হয়। এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে শাহরিয়ার কবিরের দশা বরণ করতে হবে।'[৩] বিএনপির বিরুদ্ধে লেখকের জাত-ক্রোধ ফুটে ওঠে লেখনির মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে। ক্রোধ প্রকাশ করেন তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সামরিক বাহিনীর প্রতি। তিনি এদের সবাইকে মনে করেন পাক সামরিক জান্তার পুতুল হিসাবে। যাদের নির্দেশে তারা নীল নকশার নির্বাচনটি করেছেন। গাফ্‌ফার চৌধুরীর এসব চিন্তা যে কী পরিমাণে মিথ্যা দোষে দুষ্ট ও বিভ্রান্তির, গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখনীর স্ববিরোধিতার মধ্যে দিয়েই আমি তা প্রমাণ করবো। গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখনীই আমাকে সাহায্য করবে গাফ্‌ফার চৌধুরীর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে।

> গাফ্‌ফার চৌধুরী বর্তমান সরকারের শাসন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের পর এখন চলছে প্রশাসন থেকে মুক্তিযুদ্ধ। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজনেরও পাইকারি হারে বিতাড়ন।'[৬] গাফ্‌ফার চৌধুরী এমন ভাব করছেন যেন বিএনপির শাসনের পূর্বে কিংবা আওয়ামী লীগের শাসনে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ছিলো না। তিনি যেন বিএনপির শাসনে তা প্রথম দেখলেন

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। সেটা যতো সামান্যই হোক কিংবা বেশিই হোক, হোক দুঃখজনক ঘটনা। মূলত যে কোনো ধরনের নির্যাতনই দুঃখজনক ঘটনা। সেটা মুসলমানের দ্বারা মুসলমানের ওপর নির্যাতন হলেও কিংবা হিন্দুর দ্বারা হিন্দুর ওপর। বাংলাদেশের মানুষকেই তার সমাধান করতে হবে। শাহরিয়ার কবির তার সমাধান চাইতে গিয়েছিলেন বিদেশী শক্তি ভারতের কাছে এবং ভারতের ক্ষমতায় যখন বিজেপি সরকার। যে বিজেপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বাবরী মসজিদ ভাঙার উসকানি দিয়েছিলো। সংখ্যালঘুদের স্বার্থে শাহরিয়ার কবিরও এ কাজ করেননি। করেছেন ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য। তিনি যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যেতেন তার ফল কি দাঁড়াত? ভারতের গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় যদি মনে করতো বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হচ্ছে, ভারতে এবার মুসলমান নিধন শুরু হোক। দাঙ্গা বাধতে তাহলে কতক্ষণ লাগতো? বিজেপি ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তি তো এমনি ঘটনার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। সংখ্যালঘুর প্রশ্নটিও ধর্মের মতোই একটি স্পর্শকাতর ব্যাপার। ফলে অনেকেই এখন সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের কাজে নেমেছেন। যা সারা জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

'বাংলাদেশে যখন চরমভাবে হিন্দু নির্যাতন চলছে, তখন দেশে আর্তমানবতার পাশে না দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানে মানবতার ত্রাণের নামে ছোটাছুটি করা'[৪]র জন্য আপনি ড. কামাল হোসেনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। ড. কামাল না হয় অন্যায় করেছেন মানলাম, কিন্তু আপনি নিজে কি সেদিন আর্তমানবতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন? নাকি লন্ডন শহরে বসে শুধু কামাল হোসেনকে গালাগালি করেছেন? বিনীতভাবেই বলছি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যেমন অত্যাচার হয়েছে, তেমনি তা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়িও হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা যে, বিরোধী পক্ষ এর থেকে সুবিধা নিতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার হয়েছিলো, 'বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষের পর সংখ্যালঘুদের অনেকে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয় বলে

অভিযোগ আছে। এ অভিযোগ কতটা সত্যি? এবং ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা কত?' মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন, 'কিছু ঘটনা ঘটেছে এটা দুঃখজনক বলতে পারি। কিন্তু ব্যাপকসংখ্যক মানুষ দেশ ছেড়ে চলে এসেছে এটা সঠিক নয়। তাছাড়া পরিস্থিতি এখন শান্ত হয়ে এসেছে। দেশ ছেড়ে আসার কোনো ঘটনা এখন ঘটছে না।'[৫]

গাফ্ফার চৌধুরী বর্তমান সরকারের শাসন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের পর এখন চলছে প্রশাসন থেকে মুক্তিযুদ্ধ। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজনেরও পাইকারি হারে বিতাড়ন।'[৬] গাফ্ফার চৌধুরী এমন ভাব করছেন যেন বিএনপির শাসনের পূর্বে কিংবা আওয়ামী লীগের শাসনে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ছিলো না। তিনি যেন বিএনপির শাসনে তা প্রথম দেখলেন। বিএনপির নয়, আওয়ামী লীগেরই একজন বুদ্ধিজীবী সালাহউদ্দীন আহমদ বলেছেন, 'এবার যে জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে তার মূল কারণ কিন্তু জনগণ একটা পরিবর্তন চাইছিলো। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনগণ এই পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু বিএনপির জয়লাভের পর আমরা যা দেখলাম তা কোনোভাবেই আশাব্যঞ্জক নয়। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এমন অরাজক অবস্থা দেখলাম, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।'[৭] দুর্নীতি করার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হেরেছে কিনা সেটা বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে আওয়ামী লীগ যে সন্ত্রাস করেছে সেটা সালাহউদ্দীন আহমেদ উদারভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ গাফ্ফার চৌধুরী সালাহউদ্দীন আহমদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে লিখেছেন, 'এ কথাও সত্য, আওয়ামী লীগের আমলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, সে জন্য দেশবাসী কেবল আওয়ামী লীগের শাসনকেই দায়ী করেছে। ... যে সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশকে গ্রাস করেছিল তার সিকি ভাগ যদি হয় আওয়ামী লীগের, তাহলে তার বারোআনাই বিএনপি-জামায়াত জোটের।'[৮] গাফ্ফার চৌধুরী, সন্ত্রাস যেই করুক, সরকার যদি তা দমন করতে না পারে তাহলে তো তার ক্ষমতায় থাকার যোগ্যতাই থাকে না। আর কেউ যদি আজ একইভাবে বর্তমান সরকারের সন্ত্রাসের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে তাহলে সেটা কি আপনি মেনে নেবেন? নিজেই আপনি যাদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগের ওপরতলার অধিকাংশ নেতা, যারা দলের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী, যারা সন্ত্রাস ও দুর্নীতি লালন করেছেন, নেতা পদে বা মন্ত্রীপদে বসে দলের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কাজগুলো করেছেন,... যারা উগ্র মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ কালো টাকার মালিকদের সঙ্গে আপত্তিকর যোগাযোগ রাখতেন'[৯] সেই তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? নিজেই তো আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন ওপরতলার অধিকাংশ নেতা, মন্ত্রীরা উগ্র মৌলবাদী ও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তারপরেও কি করে আপনি বিএনপি-জামায়াত জোটকে দায়ী করছেন বারোআনা সন্ত্রাসের জন্য?

গাফ্ফার চৌধুরী, পক্ষপাতিত্বের নামে সত্যকে গোপন করাটা অন্যায়। দু'জন একই দোষ করলে দু'জনকেই দোষী বলা উচিত। কিন্তু আপনি একজনকে দোষী বানান। ভিন্নজনের দোষ আড়াল করেন নিজের পক্ষের লোক বলে। মিথ্যাচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় সেটা। বাংলাদেশে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এসব চালু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। মুজিব আমলে যা চরম রূপ নিয়েছিলো। পরে প্রত্যেক সরকারের আমলে সেটা যথা নিয়মেই ঘটেছে। বিশেষ কোনো একটি দলের ঘাড়ে সে দোষ চাপিয়ে বাকিদের দোষমুক্ত রাখাটা কোনো সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। গাফ্ফার চৌধুরী, বাংলাদেশে যতোরকম অপরাধ দেখছেন তার শুরু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের শাসন থেকে। দেখুন এ ব্যাপারে আপনি নিজে কী লিখেছেন? 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র সাম্প্রদায়িক দলগুলো ছাড়া আর সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ একাই ক্ষমতায় গেছে, আর কাউকে সঙ্গে নেয়নি।' 'সম্মিলিত সশস্ত্র যুদ্ধের পর সত্তরের নির্বাচনী ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে আর এককভাবে ক্ষমতায় বসার অবকাশ থাকে না।' 'একাত্তরের অর্ধসমাপ্ত জাতীয় বিপ্লবকে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে গ্রহণ করে সুবিধা লুটতে চেয়েছে।'[১০] ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু সুবিধামতো সেটা স্বীকার করে আবার যখন অস্বীকার করার সুচতুর কৌশল অবলম্বন করেন, তখনই দেখা দেয় আপনার লেখা নিয়ে যতো ঝামেলা। কিভাবে আপনি সেটা করে থাকেন সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আওয়ামী লীগের শাসনকালটা যে লুটপাটের ব্যাপারই ছিলো সেটা নিয়ে আর একটু কথা বলা যাক।

> 'এ কথাও সত্য, আওয়ামী লীগের আমলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, সে জন্য দেশবাসী কেবল আওয়ামী লীগের শাসনকেই দায়ী করেছে। ... যে সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশকে গ্রাস করেছিল তার সিকি ভাগ যদি হয় আওয়ামী লীগের, তাহলে তার বারোআনাই বিএনপি-জামায়াত জোটের'

বাংলাদেশে শেখ মুজিবের শাসনকাল ছিলো সবচেয়ে স্বল্পকালীন। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিলো পৌনে চার বছর। সেই চার বছরে পত্রিকার পাতায় পাতায় সরকার ও প্রশাসনের ব্যাপক লুটপাট ও দুর্নীতি, লীগ সন্ত্রাসীদের রাহাজানি, হত্যা ও নারী ধর্ষণের চিত্রই দেখতে পাই। '৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে রেসকোর্সে ন্যাপের জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেছিলেন, 'বর্তমান সরকার দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।' শেখ মুজিবের শাসনে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে '৭৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্যিক সমবায় ব্যাংক উদ্বোধনকালে তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দেশে আইনশৃঙ্খলা নেই। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।' 'পুরনো ডাকাতরা আর ডাকাতি করে না। বিপথগামী যুবকরাই ডাকাতি, লুট ও হাইজ্যাক করে। বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে, তাদেরকে আবার সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইঙ্গিতে জামিন দেয়া হয়েছে।' তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ডাকাত এবং হাইজ্যাকারদের ছেড়ে দেয়ার পেছনে এমন ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন, যার নাম 'বিনা অজুতে' নেয়া যায় না।'[১১]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কে সেই ব্যক্তি যার নাম বিনা অজুতে নেয়া যেতো না? শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী মার্চের আট তারিখে এক বক্তৃতায় বলেন, 'ক্ষমতাসীন হয়ে গত ছাব্বিশ মাসে দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টকে কমাতে পারিনি। মানুষের মধ্যে নতুন অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাধীনতার স্বাদ আমরা কতিপয় সুবিধাবাদী লোক ভোগ করবো, আর দুঃখের বোঝা বইবে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ– এটা বেশি দিন চলতে পারে না। দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে গদি আটকিয়ে রাখার কোনো অধিকার আমাদের নেই।' শিক্ষামন্ত্রী সেই একই বক্তৃতায় বলেন, 'পাক-আমলে বলতাম মানুষের মনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অশান্তি দিনে দিনে ধূমায়িত হয়ে অগ্নিগিরির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিগিরির কাছে কোনো শক্তিই টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতায় বসে সে কথা ভুলে গেছি– এটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি।' তিনি আরো বলেন, 'সত্য কথা বলার সময় এসেছে।

কারচুপি করে সামনের দিকে বা প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। সত্য চাপা রাখলে আমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।'[১২] কী ধরনের লুটপাট সে সময় হয়েছিলো সেটা আওয়ামী লীগের দু'জন মন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়।

গাফ্‌ফার চৌধুরী শেখ মুজিবের সে শাসনকালকে পাঠকদের দৃষ্টির বাইরে রাখতে চাইলে যখন তিনি বিএনপির বিরুদ্ধে কলম ধরলেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে নিজের যুক্তি দাঁড় করাতে চাইলেন। তিনি লিখেছেন, 'নূরুল আমিনের পর আমরা আমাদের প্রথম যৌবনে দেখেছি ইস্কান্দার মির্জার জংলি শাসন। দেখেছি আইয়ুব-মোনেমের চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। দেখেছি ১৯৭১ সালে টিক্কা-নিয়াজি-ফরমান আলির দুঃশাসন। পরিণত যৌবনে স্বাধীন বাংলাদেশে দেখেছি মোশতাক ও তার সুর্যসন্তানদের আড়াই মাসের নবাবী। দেখেছি জিয়াউর রহমানের সান্ধ্য আইন আর ঘন ঘন ক্যু-দেতার শাসন। এরশাদের ভন্ডামি, জালিয়াতি ও দুর্নীতির স্বৈরাচার। নারী আর ধর্ম নিয়ে একই সঙ্গে প্রতারণার রাজনীতি।'[১৩] পাঠকরা খেয়াল করলে দেখবেন, মাঝখানে শেখ মুজিবের শাসনকাল সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। গাফ্‌ফার চৌধুরী, বাংলাদেশে শেখ মুজিবের শাসনকালের মতো দুঃসহ শাসনকাল তো আর ছিলো না। যদি আপনি একজন সৎ কলামিস্ট হবেন তাহলে মুজিব শাসনকাল সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? বিএনপি সরকারকে ঘায়েল করার জন্য পরের লাইনেই লিখলেন, 'এতকিছু দেখার পরে এবং ইতিবৃত্তে মাত্র একটি জীবনে এত চন্ডশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষী হওয়ার পরে এই শেষ বয়সে এসে কি বিশ্বাস করতে হবে বর্তমান খালেদা-নিজামী জোটের দুঃশাসন বাংলাদেশে বেশি দিন স্থায়ী হবে?' না, গাফ্‌ফার চৌধুরী কোনো দুঃশাসনই চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু সেজন্য শুধু বিএনপিকে দেখাচ্ছেন কেন? শেখ মুজিবের শাসনকালই কি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারতো না? চুয়াত্তর সালে শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী যে বলেছিলেন, দলের দুঃশাসনের জন্য দুর্ভোগ নেমে আসবে– সে দুর্ভোগ কি সত্যিই নেমে আসেনি পঁচাত্তর সালে আওয়ামী লীগের কপালে?

মুজিব শাসনকাল সারা জাতির জন্য এবং স্বয়ং মুজিবের জন্য কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে এনেছিলো তা কি আপনার অজানা? সারা পৃথিবী সেটা জানে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আপনার লেখা থেকেই খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক। আপনি লিখেছেন, 'ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা মনে পড়ে। তখন পাকিস্তানি আমল। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন দোর্দন্ডপ্রতাপে চলছে। কার সাধ্য তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করে। ...মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল, জেনারেল আইয়ুব খানকে দেশের যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হোক। আরও দাবি করা হয়েছিল পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য কনভেনশনে মুসলিম লীগকে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হোক।'[১৪] পাকিস্তানে আইয়ুব শাসন কতোটা স্বৈরাচারী ছিলো সেটা বোঝানোর জন্য আপনি এ দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের কাছে আইয়ুবের স্বৈরশাসন কিছুই না। মুসলিম লীগ আইয়ুব খানকে যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দিলেও পাকিস্তানের ইতিহাসে তা ঘটেনি। নির্লজ্জ আইয়ুবও যাবজ্জীবন ক্ষমতা লাভের কথা ভাবতে পারেননি। অন্যান্য দলকে নিষিদ্ধ করার সাহসও তার হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শেখ মুজিবের শাসনামলে দুটো ঘটনাই ঘটেছিলো। মুসলিম লীগ ষাটের দশকে যা ভেবেছিলো কিন্তু করতে সাহস পায়নি, সত্তরের দশকে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ অক্ষরে অক্ষরে সেই কাজটিই করেছিলো।

> 'প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এক আদেশ বলে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এখন হইতে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে। ... সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করিবেন এবং উহা পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হাতে ন্যস্ত থাকিবে'

শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী যখন মনে করছেন, সরকারের ব্যর্থতার জন্য গদিতে টিকে থাকারই অধিকার নেই, শেখ মুজিব সে সময় উল্টো আরো সকল ক্ষমতাই নিজের কুক্ষিগত করেন। সে সময়কার যে কোনো দৈনিকের পাতা খুললেই তার প্রমাণ মিলবে। পঁচাত্তর সালের বাইশে জানুয়ারি ইত্তেফাক পত্রিকার একটি শিরোনাম ছিলো, 'দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান'। ব্যক্তির হাতে যখন রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয় তখন কি গণতন্ত্র বলতে আর কিছু থাকে? সেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে ইত্তেফাক পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ছিলো, 'রাষ্ট্রপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম'। পত্রিকার সেই সংখ্যায় এ কথাও বলা হলো, 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন'। শেখ মুজিব বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েমের মধ্যে দিয়া দেশে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা হইলো'। যিনি সারাজীবন সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের জন্য আন্দোলন করলেন, তিনি আইয়ুবের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেই ফিরে গেলেন। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করলেন। গাফ্‌ফার চৌধুরী, আপনি জেনারেল জিয়াকে বলছেন আইয়ুবের পদাঙ্ক অনুসরণকারী, শেখ মুজিব বাদ পড়লেন কেন? শেখ মুজিবকে আমরা মুসলিম লীগের পদাঙ্ক অনুসারীও বলতে পারি। মুসলিম লীগ আইয়ুবকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে পরামর্শ শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে কার্যকর করলেন, নিজের দল ছাড়া বাকি সব দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

পঁচাত্তরের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাক পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হলো, 'প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এক আদেশ বলে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এখন হইতে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে। ... সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করিবেন এবং উহা পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হাতে ন্যস্ত থাকিবে। প্রেসিডেন্টের এই আদেশের ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট অন্য কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।' পুরো রাষ্ট্রটাই শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন হয়ে গেল। কিন্তু কীভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যাবে কিংবা কত বছর পর কীভাবে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া যাবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা ছিলো না। স্বভাবতই শেখ মুজিব আজীবনের জন্য ক্ষমতা লাভ করলেন। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শেখ মুজিব একজন রাজার সমান ক্ষমতার অধিকারী হলেন বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানে যা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। পঁচাত্তর সালের জুন মাসের সতেরো তারিখে ইত্তেফাক পত্রিকার এক সংবাদে আমরা দেখতে পাই দৈনিক ইত্তেফাক,

দৈনিক বাংলা, অবজারভার ও টাইমস ছাড়া বাকি সব পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

বুঝলেন ভায়া, যদিও বাংলাদেশের জনগণ আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলো কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি শেখ মুজিবের শাসন আইয়ুবের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে শুভ পদযাত্রা শুরু হতে পারতো শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছিলো। জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেদিন শেখ মুজিবের একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং সংসদ সদস্যের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের সে স্বৈরশাসনের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদও জড়িত ছিলেন না। শেখ মুজিব ইতিপূর্বেই তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী, পাঠকদের কাছে আপনি তা গোপন করে আওয়ামী লীগকে একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবকে গণতন্ত্রের বিশাল ধারক-বাহক হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কিসের লোভে বলুন তো এই মিথ্যাচার? বিএনপির বর্তমান শাসন সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, 'দেখেশুনে মনে হয়েছে, দেশে শুধু একটি দল বা জোট থাকবে, একটি দলীয় প্রশাসন থাকবে। একটি পলিটিক্স ও পলিটিক্যাল কালচার থাকবে। আর সবকিছু ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলা হবে। এটা কী ধরনের গণতন্ত্র! কী ধরনের সভ্য শাসন।'[১৫] সেটা তো শেখ মুজিবের শাসনকালের ঘটনা। সে ধরনের শাসন তো আওয়ামী লীগের হাতে এ দেশে চালু হয়েছিলো। বিএনপি তা করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকেই আমরা দেখতে পাই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু হাসিনা নাকি আপনাকে বলেছেন, 'আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে খারাপ হই ভালো হই একটি গণতান্ত্রিক দল।' পঁচাত্তরের পরে দলকে পুনর্গঠনের প্রশ্নেও নাকি তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সংগঠিত হতে হয়েছে।'[১৬] গাফ্ফার চৌধুরীও বিএনপি'র বিরুদ্ধে সেই আওয়ামী লীগকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে দেখাতে চান। কিন্তু আমরা দেখি রাজনৈতিক দল হিসেবেও আওয়ামী লীগ কোনো গণতান্ত্রিক দল নয়। গাফ্ফার চৌধুরী নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু জেলা পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে তুলে এনেছিলেন কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, আবদুল মান্নান প্রমুখকে। তাজউদ্দিন আহমদকে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে বসাতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। তাতেও বঙ্গবন্ধু সন্তুষ্ট হননি। তিনি দলের দ্বিতীয় টায়ারের নেতৃত্ব গঠনের জন্য তৎকালীন যুব নেতাদের সংগঠিত করেছিলেন।'[১৭] সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন শেখ মুজিব একা। যদিও লেখক শেখ মুজিবের প্রশংসা করার জন্যই কথাগুলো বলছেন কিন্তু সচেতন পাঠক বুঝতে পারবেন, শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিলো আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব ভিন্ন অন্য কোনো নেতা-কর্মীদের ইচ্ছার কোনো মূল্যই ছিলো না সেখানে। দলীয় সিদ্ধান্তের কোনো প্রশ্ন নেই। যার শেষ পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশে দল ও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা শেখ মুজিবের নিজের হাতে গ্রহণ।

গাফ্ফার চৌধুরী শেখ হাসিনার সময়কাল সম্পর্কে লিখছেন, 'শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর প্রবীণ নেতাদের একে একে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, অনেককে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন। কিন্তু জেলা পর্যায় থেকে কোনো আদর্শবান ও সৎ নতুন নেতৃত্ব তুলে আনতে পারেননি। যাদের এনেছেন হয় তারা বিতর্কিত চরিত্রের আত্মীয়

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শেখ মুজিব একজন রাজার সমান ক্ষমতার অধিকারী হলেন বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানে যা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। পঁচাত্তর সালের জুন মাসের সতেরো তারিখে ইত্তেফাক পত্রিকার এক সংবাদে আমরা দেখতে পাই দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, অবজারভার ও টাইমস ছাড়া বাকি সব পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়

অথবা সন্ত্রাস বা অন্য কোনো কারণে অঞ্চলের মানুষ তাদের নামে শঙ্কিত। শেখ হাসিনা তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বিতীয় টায়ার হিসাবে কোনো যোগ্য যুব নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেননি। অথবা গড়ে উঠতে দেননি।'[১৮] কী প্রমাণ করে? গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে বলে দাবি করে যে আওয়ামী লীগ, তার দলের ভেতরেই গণতন্ত্রের চর্চা নেই। শেখ হাসিনা সে দলের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শেখ হাসিনার কথায়ই সেখানে সবকিছু ঘটছে। গাফ্ফার চৌধুরী গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে যতোই চেঁচামেচি করুন না কেন, দলের ভেতর স্বৈরশাসনে তিনিও বিশ্বাস করেন। ভালোভাবেই বিশ্বাস করেন। সেজন্য তিনি শেখ হাসিনাকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনে শেখ হাসিনাকে তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ কাউকেই কানকথায় নির্ভর করে অবিশ্বাস করলে চলবে না। বরং তাদের আরো কাছে টানতে হবে। দলের প্রবীণ-নবীন সহকর্মীদের তিনি অবিশ্বাস করবেন না, সন্দেহের চোখে দেখবেন না। তবে পর্যবেক্ষণ করবেন তাদের কার্যকলাপ। কারও কার্যকলাপ সীমার বাইরে গেলে তখন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'[১৯] গাফ্ফার চৌধুরী দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের কথা বলেননি, বলছেন হাসিনার সিদ্ধান্তের কথা। সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যেন হাসিনার হাতে। তোফায়েল-রাজ্জাকরা যেন দলের কেউ না। গণতন্ত্র সম্পর্কে গাফ্ফার চৌধুরী নিজে কী বোঝেন সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি দলের মধ্যে ব্যক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন।

ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় নির্বাচন শেষ হয়েছে আজ পাঁচ মাস। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী এখনো সেটাকে নীল নকশার নির্বাচন প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে থাকতেন কথা ছিলো না। তিনি এখন পাগলের প্রলাপ করছেন। তিনি নতুন একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তার সে তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আসলে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিশেষ করে আইএসআই-এর দ্বারা। তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পরাজয়, শেখ মুজিব সরকারের পতন সবকিছুর জন্যই দায়ী করেন আইএসআইকে। তিনি লিখছেন, 'পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের মিলিটারি জান্তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তৎকালীন আওয়ামী লীগকে নিয়ে খেলেছে।' 'বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় তাকে চক্রান্ত ও রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হয়েছে। দলের প্রধান নেতাদের অধিকাংশকে হত্যা করার পরও আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা ধ্বংস করতে না পারায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার চোরাগলিতে ট্যাপে ফেলার নতুন চক্রান্ত হয়। ততদিনে পাকিস্তানের আর্মি বুরোক্র্যাসির রুলিং জান্তার ছাতার নিচে বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি রুলিং চক্র গড়ে ওঠে।'[২০]

গাফ্ফার চৌধুরী লিখছেন, '১৯৯১-৯৬ সালের পাঁচ বছরের মেয়াদে খালেদা জিয়ার সরকার দেশ পরিচালনায় চরম অযোগ্যতার পরিচয় দেয়। ফলে দেশে গণঅসন্তোষ ক্রমবর্ধমান হয়ে ৭১-এর মতো বাংলাদেশী রুলিং ক্লাসকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে এই আশঙ্কায় আওয়ামী লীগকে এক টার্মের জন্য ক্ষমতায় বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। ক্ষমতায় বসিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতোই শেখ হাসিনাকে দিয়ে গণবিরোধী স্বৈরাচারী

শাসনের লেগাসিগুলো বজায় রাখা এবং শাসন ব্যবস্থায় সিভিল ও মিলিটারি ব্যুরোক্র্যাসির আধিপত্যমূলক অবস্থানের স্ট্যাটাটস্কু বহাল রাখার কাজে তার সরকারকে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা ধ্বংস করার পর এই দলকে ক্ষমতা থেকে অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপের সুচতুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।'[২১] ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় বসা ও ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পেছনে জনগণের কোনো ভূমিকা নেই। সবটাই বাইরের শক্তির কাজ। তিনি আরো লিখছেন, 'বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পার্বত্য শান্তিচুক্তি করার পর পাকিস্তানের সামরিক এস্টাবলিশমেন্ট বিশেষ করে আইএসআই হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় শত্রুতার নীতি গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের নীল নকশা তৈরি হয়।'[২২] গাফ্ফার চৌধুরী পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি একবার বলছেন, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাবার আগেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছিলো তাকে এক বছরের বেশি ক্ষমতায় রাখা হবে না। পরে আবার বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির কারণেই তাকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। ঠিক অন্যত্র আবার লিখেছেন, '২০০১ সালের জুন মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগের জয়ের সম্ভাবনা ছিলো বেশি।'[২৩] যদি তাকে নীল নকশা করেই হারানো হয়ে থাকে তাহলে তিন-চার মাস নির্বাচন এগিয়ে আনলেই বা তিনি জিততেন কী করে? নির্বাচন তো পরিচালনা করতেন শাহাবুদ্দীন আহমেদ, লতিফুর রহমান ও সাঈদ গংরাই। গাফ্ফার চৌধুরী আসলে বাজে বকতে বকতে কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় শাসনকালটা দেখা যাক। গাফ্ফার চৌধুরীর ভাষায়, 'ক্ষমতায় বসার অতি অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ জনসম্পৃক্ততা হারাতে শুরু করে। দেশের পেশাজীবী শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ—শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। দলের তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন নেতারা সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। সংগঠনের চেয়ে সরকার পরিচালনা নেতাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে।... দলের সাধারণ কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে সরকারের সংযোগহীনতার ফলে সরকার ক্রমশ আমলা নির্ভর হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে শেখ হাসিনার চারপাশে গড়ে ওঠে সুযোগ সন্ধানী নব্য আওয়ামী লীগার ও পরিবারতন্ত্রের দেয়াল।'[২৪] যদি এই হয় আওয়ামী লীগের শাসনকাল তাহলে কি তাকে নির্বাচনে হারাবার জন্য আদৌ কোনো নীল নকশার প্রয়োজন আছে? যে দল জনবিচ্ছিন্ন তার তো এমনিতেই হেরে যাবার কথা। সেই সঙ্গে রয়েছে মন্ত্রীদের, দলের ঊর্ধ্বতনদের সন্ত্রাস, দুর্নীতি যা গাফ্ফার চৌধুরী নিজেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী তা সত্ত্বেও মনে করেন নীল নকশা করেই হারানো হয়েছে আওয়ামী লীগকে। তিনি লিখেছেন, 'বর্তমান খালেদা-নিজামী জোটের শাসন কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে স্বাভাবিক বিপুল বিজয়ের অধিকারী কোনো গণতান্ত্রিক জোটের স্বাভাবিক শাসন বা আচরণ নয়। এটা এক কথায় প্রচন্ড প্রতিহিংসার এবং মানসিক অস্থিরতার শাসন। এই অস্থিরতা বা অপ্রকৃতিস্থতা কি অবচেতন মনে নির্বাচনী বিজয় ছিনতাইয়ের গ্লানি থেকে তৈরি হয়েছে?'[২৫] তিনি নির্বাচনে কারচুপির প্রসঙ্গই টেনে আনছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করতে গিয়ে অন্যত্র আবার লিখছেন, 'নির্বাচনের আগে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় দেখা গেছে আওয়ামী লীগের ভেতরে জটিল দলীয় কোন্দল। সর্বত্র আওয়ামী লীগ যেন আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ। বিএনপি-জামায়াত জোটকে তো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। কেবল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের ফসল তারা নিজেদের ঘরে তুলেছেন।'[২৬] গাফ্ফার চৌধুরী, দয়া করে কি আমাদের বলবেন, আপনার কোন কথাটা সঠিক এবং কোন কথাটা আমরা বিশ্বাস করবো?

তিনি লিখছেন, 'জামায়াত ইসলাম আইএসআইয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশেই '৯৬ সালে বিএনপির কাছ থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরার নীতি গ্রহণ করেছিল বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' তিনি আরো লিখছেন, 'ছিয়ানব্বই-এর নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বিএনপি সুস্পষ্টভাবেই দেশের আসল রুলিং কোটারির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলো যে, সংসদে না গেলেও তাদের ক্ষতি নেই। সংসদের বাইরে থেকে আওয়ামী সরকারকে হরতাল-ধর্মঘটের নামে ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্থিতিহীন করে রাখাই হবে বিএনপি'র পাঁচ বছরের রাজনৈতিক কর্মসূচি। এ কাজে তাদের অক্সিলিয়ারি ফোর্স হবে পাকিস্তানি মাদ্রাসায় আইএসআইয়ের তত্ত্বাবধানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র ও তালেবানরা।' [২৭]

তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, বিএনপি'র সাবেক শাসনামলে আওয়ামী লীগ যে দীর্ঘদিন সংসদের বাইরে থেকে হরতাল পালন করলো এবং বর্তমান বিএনপি'র শাসনামলে সংসদ বর্জন করে চলেছে সেটা কোন আইএসআইর নির্দেশে? তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিস্ফোরণোন্মুখ করে তোলার লক্ষ্যেই আইএসআই'র পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটানো হয় যশোর, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট প্রভৃতি এলাকায়।' গাফ্ফার চৌধুরী সবকিছুর জন্যই আইএসআইকে দায়ী করছেন কিন্তু অন্যত্র আবার লিখছেন, 'খালেদা-নিজামী সরকারকে শিগগিরই আক্রমণাত্মক নীতির বদলে আত্মরক্ষামূলক নীতিতে পিছিয়ে যেতে হবে। প্রচন্ড গণআন্দোলনের ফলে তারা যদি গ্যাস ও তেল রপ্তানির ব্যাপারে নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারেন, তাহলে আমেরিকা ও ভারতের বিশেষ করে ভারতের অনুগ্রহ দৃষ্টি থেকে তারা বঞ্চিত হবেন।' যার কী অর্থ দাঁড়ায়? ভারতকে তেল-গ্যাস দেয়ার শর্তে বিএনপি জোট ক্ষমতায় এসেছে। মূল তাহলে আইএসআই নয়? ভারতের স্বার্থরক্ষার চুক্তি করে যদি বিএনপি জোট ক্ষমতায় এসে থাকে তাহলে আইএসআই তাকে নির্বাচনে জেতাবার জন্য নীল নকশা করতে যাবে কেন? কোনটি এবার আপনার অপ্রিয় সত্য বলুন তো? ভারত না আইএসআই? বিজ্ঞ গাফ্ফার চৌধুরী, যদি আপনার কথা সত্যি হয় যে, পাকিস্তানের সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের কিংবা ভারতের প্রভাব বলয়ের মধ্যে আমরা আটকে আছি তাহলে কি আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক বলে দাবি করতে পারি? যদি আমরা অন্তত পাকিস্তানের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে না পারি তাহলে তো একাত্তরের পুরো মুক্তিযুদ্ধই ব্যর্থ। শেখ মুজিবকে তো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বলারও কোনো কারণ থাকে না, যা আপনারা বলে থাকেন।

দেখুন, এসব ব্যাপারে আমি নিজের কোনো বক্তব্য দিচ্ছি না। আপনার দেয়া বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, সত্য কোনটি?

পাকিস্তানের সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের কিংবা ভারতের প্রভাব বলয়ের মধ্যে আমরা আটকে আছি তাহলে কি আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক বলে দাবি করতে পারি? যদি আমরা অন্তত পাকিস্তানের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে না পারি তাহলে তো একাত্তরের পুরো মুক্তিযুদ্ধই ব্যর্থ। শেখ মুজিবকে তো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বলারও কোনো কারণ থাকে না, যা আপনারা বলে থাকেন

তথ্যসূত্র
১. সাপ্তাহিক ২০০০, জানুয়ারি ১১, ২০০২, পৃ. ২২
২. দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০০২
৩. দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০০২
৪. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০২
৫. দৈনিক আজকের কাগজ, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০০২
৬. দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ৪, ২০০২
৭. দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০০২
৮. দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ৮, ২০০২
৯. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
১০. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০২
১১. দৈনিক গণকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ১৯,১৯৭৪
১২. দৈনিক গণকণ্ঠ, মার্চ ৯, ১৯৭৪
১৩. দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ৪, ২০০২
১৪. দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ৪, ২০০২
১৫. দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ৪, ২০০২
১৬. দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারি ১১, ২০০২
১৭. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
১৮. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
১৯. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
২০. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০২
২১. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০২
২২. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০২
২৩. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
২৪. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০২
২৫. দৈনিক যুগান্তর, মার্চ ৪, ২০০২
২৬. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০২
২৭. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০২
২৮. দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০২
২৯. দৈনিক প্রথম আলো, জানুয়ারি ১১, ২০০২